

প্রচলিত বিভিন্ন খতম তাৎপর্য ও পর্যালোচনা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ খতমে কুরআন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

খতমে বুখারী

মুমিন ব্যক্তির জীবনে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীস ছাড়া মুমিন তাঁর ইসলামী জীবন কল্পনা করতে পারে না। কুরআন হাদীস উভয় মিলেই তাঁর জীবন পরিচালিত। তাই কুরআনের মতই হাদীস শিক্ষা করা, হাদীস চর্চা করা মুমিনের জন্য অপরিহার্য। প্রতিটি মুমিনের জন্য জ্ঞান শিক্ষা করা ফরয। আর কুরআন ও হাদীসই হচ্ছে মুসলিমের মূল জ্ঞান ভাণ্ডার। এই হাদীস শিক্ষা, চর্চা, মুখস্থ রাখা, সংরক্ষণ করা ও প্রচার প্রসারে সাহায্যে কেরাম থেকে শুরু করে উম্মতের একদল আলেম তাদের জীবনের পুরো অংশটিই ব্যয় করে দিয়েছেন। যাদের মেহনত, শ্রমের বদৌলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সঠিকভাবে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه ».

(سنن أبي داود، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، رقم: 3662، سنن الترمذي، كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الحث على تبليغ السماع، رقم: 3656)

“আল্লাহ তাঁর চেহারাকে উজ্জ্বল করুন যে আমার কাছ থেকে কোনো হাদীস শুনল, অতঃপর সে তা সংরক্ষণ করল, এমনকি তা অন্যের কাছে পৌঁছাল। অনেক ফিকহ (হাদীস) এর ধারক এমন রয়েছে, সে যার কাছে পৌঁছায় সেই ব্যক্তি তাঁর চেয়ে অধিক ফকীহ। আর অনেক ফিকহের ধারক নিজে ফকীহ নয়।”[1]

হাদীসটির মর্ম হচ্ছে, অনেক সময় এমনও হয় যে, যার কাছে পৌঁছানো হয় সে হাদীসের মর্ম বা ভাব যিনি পৌঁছিয়েছেন তার চেয়ে বেশি বুঝেন। আবার এমনও অনেক রয়েছেন যিনি শুধুমাত্র হাদীসটি মুখস্থ রাখতে পেরেছেন কিন্তু তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি, হতে পারে যার কাছে পৌঁছাবেন তিনি এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেন, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসকে বেশি বেশি পৌঁছানো ও প্রচারের দিকে উৎসাহিত করেছেন।

উলামায়ে কেরামের এই দল উক্ত হাদীসের পুরোপুরি হক্ক আদায় করার চেষ্টা করেছেন।

এদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর নামে মিথ্যা বানিয়ে বলার দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা পাওয়া গেলেও সাধারণত কেউই সে সময় তাঁর নামে মিথ্যা কথা বলার সাহস পেত না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর মিথ্যা বানিয়ে বলা শুরু হয়। মুনাফেক, ফাসেক, স্বার্থান্বেষী তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রাসূলের নামে মিথ্যা বানিয়ে বলত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বলে সরলমনা মুসলিমদের ধোকা দেওয়া সহজ ছিল। কিন্তু হাদীস গ্রহণে সাহাবিদের সতর্কতা ও যাচাইয়ের কারণে তা তাদের মধ্যে খুব প্রসার লাভ করতে পারে নি। প্রখ্যাত তাবিয়ী মুজাহিদ (রহ.)[2] বলেন:

"جاء بشير العدوى إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا تسمع. فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف". (صحيح مسلم، مقدمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، 1-10)

“(তাবিয়ী) বুশাইর আল-আদাবী ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে আগমন করেন এবং হাদীস বলতে শুরু করেন। তিনি বলতে থাকেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) তার দিকে কর্ণপাত করলেন না। তখন বুশাইর বলেন: হে ইবনু আব্বাস, আমার কি হলো! আমি আপনাকে আমার হাদীস শুনতে দেখছি না? আমি আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস বর্ণনা করছি, অথচ আপনি কর্ণপাত করছেন না!? তখন ইবনু আব্বাস (রা) বলেন: একসময় ছিল যখন আমরা যদি কাউকে বলতে শুনতাম: ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন’, তখনই আমাদের দৃষ্টিগুলো তাদের দিকে আবদ্ধ হয়ে যেত এবং আমরা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তাঁর প্রতি কর্ণপাত করতাম। কিন্তু যখন মানুষ খানাখন্দক ভালমন্দ সব পথেই চলে গেল তখন থেকে আমরা আর শুধুমাত্র সুপরিচিত ও পরিজ্ঞাত বিষয় ব্যতীত মানুষদের থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করি না।”[3]

মুসলিম উম্মাহর ভিতরে মিথ্যাবাদী হাদীস বর্ণনাকারীর উদ্ভব হবে বলে নবী আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক করেন। তার থেকে কিছু শুনেই যাচাই ছাড়া নির্বিচারে গ্রহণ করা, বর্ণনা করা থেকে উম্মতকে সর্বোচ্চ সতর্ক ও সাবধান করে দেন। মিথ্যা বা সন্দেহযুক্ত হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ আরোপ করেন। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أَنْاسٌ يُحَدِّثُونَكَ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَأَيُّكُمْ وَإِيَّاهُمْ » (صحيح مسلم، المرجع السابق)

“শেষ যুগে আমার উম্মতের কিছু মানুষ তোমাদেরকে এমন সব হাদীস বলবে যা তোমরা বা তোমাদের পিতামহগণ কখনো শুনেন নি। খবরদার! তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে, তাদের থেকে দূরে থাকবে।”[4] আবু হুরাইরা (রা.) থেকে আরেকটি হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع »

“একজন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে।”[5]

এভাবে অগণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে উম্মতকে সর্বোচ্চ সতর্ক করেছেন।

একদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর্কবাণী, অপরদিকে জালিয়াতদের জালিয়াতী উম্মতের এই শ্রেষ্ঠ জাতি উলামাদল তথা মুহাদ্দিসীনের শ্রমকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে বর্ণিত অগণিত হাদীসের মধ্য হতে প্রকৃত হাদীসটি খোঁজে বের করতে তাদেরকে অনেক শ্রম দিতে হয়েছে। হাদীস মূলত কুরআনের ব্যাখ্যা বা প্রজ্ঞা হিসেবে কুরআনের মতই তার হেফযত করতে আল্লাহ তা‘আলা এ

ধরনের আলেমের এক ঝাঁক তৈরী করে দেন। যারা তাদের জীবনের সিংহভাগই হাদীস চর্চার পিছনে ব্যয় করে রাসুলের প্রকৃত বাণীটি উম্মতের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হন। আর একেই আমরা সহীহ হাদীস বা বিশুদ্ধ হাদীস বলে জানি।

উলামায়ে উম্মতের এই শ্রেণির অন্যতম ছিলেন ইমাম বুখারী রাহ.। আরব রীতি অনুযায়ী বংশধারা সহ তার পুরো নাম হলো, মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরাহ ইবন বারদিযবাহ। তার মূল নাম মুহাম্মদ। তিনি ১৯৪ হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৩ তারিখ রোজ শুক্রবার (৮১০ খ্রিস্টাব্দ) খোরাসানের বুখারা এলাকায় (বর্তমানে উজবেকিস্তানের অংশ) জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৯ বৎসর বয়সে কুরআন মুখস্থ শেষ করেই ১০ বৎসর বয়স থেকে হাদীস মুখস্থ, হাদীসের চর্চা, হাদীস সংরক্ষণ করতে বিভিন্ন মুহাদ্দিসের কাছে যাতায়াত শুরু করেন। তার মেধা ছিল বর্ণনাতীত। তার মেধা, হাদীস গ্রহণে সতর্কতার বিভিন্ন ঘটনা কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে। তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্ম ‘সহীহুল বুখারী’ নামে প্রসিদ্ধ হাদীসের এই গ্রন্থটির রচনা বলে উল্লেখ করেছেন উলামায়ে কেরাম। হাদীসের উপর পূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জনের পর ২১৭ হিজরী সনে তার বয়স যখন ২৩, তখন তিনি এই গ্রন্থটির রচনা শুরু করেন। গ্রন্থটিতে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসকেই স্থান দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি দীর্ঘ ষোল বছর সাধনার মধ্য দিয়ে ২৩৩ হিজরী সনে এর কাজ সমাপ্ত করেন। রচনাকালে তিনি সর্বদা সওম পালন করতেন এবং প্রতিটি হাদীস লিখতে গোসল করে দু রাক‘আত সালাত আদায় করতেন বলে জানা যায়। বিশুদ্ধতার উপর নিশ্চিত হওয়ার আগে কোনো হাদীস লিখতেন না। বর্ণনায় আরো জানা যায় যে, তিনি বিশুদ্ধ থেকে বিশুদ্ধতম হাদীসের সংকলনের ইচ্ছায় তার মুখস্থ অনুমানিক ছয় লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে একেবারে সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীসটিকেই এই গ্রন্থে স্থান দেন। এত সংখ্যক হাদীস থেকে বিভিন্ন হাদীস বারবার বর্ণনা সহকারে মাত্র ৭২৭৫ বা তার সামান্য কমবেশ[৬] হাদীস তার কিতাবে স্থান পেয়েছে। সহীহুল বুখারী হিসেবে কিতাবটির নাম সর্বজনের কাছে পরিচিত। তবে তার মূল নাম হচ্ছে ‘আল-জামি‘উস-সহীহ’। ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল, মোতাবেক ৩১ আগষ্ট ৮৭০ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার দিবাগত রাতে ৬২ বৎসর বয়সে এই মহান ব্যক্তিত্ব মারা যান।[৭]

উলামায়ে উম্মতের মূলধারার আলেম তথা আহলুসুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমদেরকে সর্বদা সহীহ হাদীসকেই গ্রহণ করতে এবং অন্যান্য ভেজালযুক্ত হাদীসকে চিহ্নিত করে প্রত্যাখ্যান করতে দেখা গেছে। জানা অবস্থায় কেউই সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোনো হাদীস গ্রহণ করতেন না। সহীহ হাদীস ছাড়া শরীয়তের বিষয়াদি প্রমাণ করতেন না। ইমাম বুখারী তাঁর এই রচনায় সহীহ গ্রহণের প্রচেষ্টায় পূর্ণ সফল হয়েছেন বলে সমস্ত উলামায়ে মুহাদ্দিসীন যাচাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি তার চেষ্টায় সফল হওয়ায় সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে তাঁর কিতাবের সুনাম, সুখ্যাতি ও মূল্যায়ন ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কিতাব দল মত নির্বিশেষে সর্বজনের কাছে ‘আসাম্বুল কুতুব বা ‘দা কিতাবিল্লাহ’ বা কুরআনের পর সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ কিতাব হিসেবে ভূষিত হয়। এর মত আরেকটি কিতাব ‘সহীহ মুসলিম’ ছাড়া অন্য সব কিতাবের হাদীস যাচাই করে নেওয়াকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম জরুরী মনে করলেও তাঁর এ কিতাবের হাদীসগুলো নির্বিচারে গ্রহণের অনুমোদন দেন।

এই হলো ‘সহীহুল বুখারী’ বা আমাদের মাঝে ‘বুখারী শরীফ’ হিসেবে পরিচিত কিতাবের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সারকথা। অত্যন্ত সংক্ষেপে আমরা যে সার কথাটি জানলাম তা হলো,

*‘সহীহুল বুখারী’ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারীর লিখিত একটি হাদীসের কিতাব।

* এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপুল সংখ্যক বিশুদ্ধ হাদীসের এক বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে।

* তাঁর কিতাবের সমস্ত হাদীস বিশুদ্ধ বলে মুহাদ্দিসীনে কেরামের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে।

* যাচাই বা নিরীক্ষা ছাড়াও আমরা তাঁর কিতাবের হাদীস গ্রহণ করতে পারি।

তাঁর কিতাবের হাদীসগুলো সহীহ জানার পর এখন আমাদের করণীয় কী? এই প্রশ্নের উত্তর আহলুস্‌সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমদের কাছে একটিই। আর তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা মোতাবেক আমাদের করণীয়:

* হাদীসগুলো থেকে আমাদের জ্ঞান আহরণ করতে হবে।

* বেশি বেশি এই হাদীসগুলোর চর্চা করতে হবে।

* হাদীসগুলো নিজে বুঝা এবং অপরকে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে।

* হাদীসগুলো মুখস্থ করা, বর্ণনা করা, তার প্রচার প্রসার করতে হবে। হাদীসের ক্ষেত্রে এই হলো রাসূলের শিক্ষা। সাহাবায়ে কেরামের জীবন থেকেও আমরা এই শিক্ষাই দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বীকৃত খাইরুল কুরানেও এই ছিল হাদীসের ক্ষেত্রে তাদের আচরণ।

এর বিপরীত ঈসায়ে ছওয়াবের জন্য হাদীস তেলাওয়াত করা, অসুস্থ হলে বা যে কোনো বিপদে মুসিবতে পড়লে হাদীস পাঠ করে দো‘আ করার কোনো নজীর না রাসূলের শিক্ষায় রয়েছে, না সাহাবিদের জীবনে রয়েছে, না খাইরুল কুরানে রয়েছে। কিন্তু কে বা কারা কুরআনের মত বিভিন্ন বাহানায় এই কিতাবের হাদীসকে তাদের অর্থ উপার্জনের জন্য ‘খতমে বুখারী’ নামে এই প্রসিদ্ধ ‘সহীহুল বুখারী’ কিতাবের খতম বের করেছে তার কোনো হাদীস না থাকলেও আমাদের মাঝে তা অত্যন্ত প্রসার লাভ করেছে। এই কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দো‘আ করলে নাকি দো‘আ কবুল হয়। রাসূলের বাণী ছাড়া এমন কথা বলার সাহস আমরা কী-ভাবে পাই তাতে অবাক লাগে। এর নাম আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর মিথ্যা অপবাদ নয় কি? আমাদের বাস্তব জীবনে এই কিতাবের হাদীসের তেমন একটা গুরুত্ব না দেখা গেলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষার উল্টো বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহ এবং এই বিপরীতমুখি শিক্ষার দিকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে দেখা যায়। পেটপূজারী বা আলেম নামে অজ্ঞ কোনো ব্যক্তি হয়তো এর সূচনা করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে খাইরুল কুরানের বিপরীত কর্ম কী-ভাবে বর্তমান আহলুস্‌সুন্নাহ ওয়াল জামাত দাবীদার আলেমদের মাঝে প্রচলন লাভ করে তা ভেবে পাওয়া মুশকিল। অর্থের লোভ ছাড়া বাহ্যত আর কোনো কারণ না দেখে গেলেও এতসব আলেমকে এদিকে সম্পৃক্ত করাটাও দুষ্কর। আল্লাহই ভাল জানেন।

কথিত রয়েছে, ইমাম বুখারী রাহ. না কি এই কিতাব শেষ করে দো‘আ করেছিলেন। এই বাহানায় এই কিতাবের খতমের দিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়ে থাকে।

পাঠক, এই কথাকে আপনি নিজের বিবেক খাটিয়ে একটু চিন্তা করে বুঝুন। ইমাম বুখারী রাহ. এত বছরের সাধনায় যে কর্ম করেছেন তা তাঁর একটি নেক আমল। কুরআন ও হাদীসের ভাষায় যা ‘আমলে সালেহ’। তাঁর কর্মটি যে ‘আমলে সালেহ’ এতে কোনো সন্দেহ নেই। হাদীসের মাধ্যমে আমরা তা প্রমাণ করেছি। ‘আমলে সালেহ’ বা নেক কর্মের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। আমলে সালেহের পর দো‘আ কবুল হয় বলে হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। তাই বুখারী রাহ. এর জন্য এটা করা স্বাভাবিক। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, ‘আমল’ কোনটি সালেহ আর কোনটি সালেহ নয় তা সম্পূর্ণ তাওকীফী বা নুসূস নির্ভর বিষয়। ওহির

বাইরে যুক্তি দিয়ে এ বিষয়ে কিছু বলার সুযোগ নেই। ইমাম বুখারী রাহ. এর কর্মটি আমলে সালাহ হওয়ার বেলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী রয়েছে। কিন্তু আমাদের এই কর্ম কি তাই? তার কর্ম আর আমার কর্ম কি এক? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এমনটি করতে বলেছেন? সাহাবিরা কখনো এমনটি করেছেন? এসবের উত্তর যদি ‘না’ হয় তবে কোন বাহানায় আমরা এ ধরনের কর্মের বৈধতা দেই? না কি উপার্জনের স্বার্থে হালালকে হারাম করার মত পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা আমরা অর্জন করেছি?

এই খতমের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য আরো বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম বুখারী রাহ. নাকি এই কিতাবের কাজ সমাপ্তির পরে আল্লাহর কাছে দো‘আ করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর এই কিতাবটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দো‘আ করবে আল্লাহ যেন তাঁর দো‘আ কবুল করেন। এ থেকেই নাকি এই খতমের সূত্রপাত। পাঠক, এই কথাটি আপনি কী হিসেবে দেখেন? বুখারী রাহ. এর কিতাব রচনার প্রেক্ষাপটের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে আপনি এমন কোনো কথা পাবেন না। ‘সহীহুল বুখারী’ রচনার কয়েক শতাব্দী পর পর্যন্ত ইমাম বুখারী রচিত এ গ্রন্থের চর্চা, তার খেদমত অত্যন্ত ব্যাপক হারে হলেও খতমের নজীর দেখবেন না। এ থেকেই এসব কিছু যে বানানো গল্প তা অতি সহজে অনুমেয়। তা ছাড়া বুখারী রাহ. এর মত বিশুদ্ধ আকীদার ধারক ব্যক্তির দিকে এমন কথার অপবাদ দেওয়া কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা বিবেকের কাছে প্রশ্ন। ইমাম বুখারী রাহ. তিনি কি শারি‘ তথা শরীয়ত প্রবর্তক? তিনি এমন কথা বললে তা অনুসরণযোগ্য হবে? নাকি তার আকীদা প্রশ্নবিদ্ধ হবে? যাই হোক আমরা অযথা অনির্ভরযোগ্য কোনো কথার উপর ভিত্তি করে ইমাম বুখারী রাহ. এর ব্যক্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারি না। আমরা এই কথাগুলোকেই অসার বলে ধরে নেই। বুখারী পড়ে দো‘আ কবুল হলে রাসূলের অন্য সব হাদীসের কি দোষ? নাকি আপনার অভিজ্ঞতায় অন্য হাদীস পড়ে দো‘আ করলে তা কবুল হয় না, শুধু এই কিতাবের হাদীস পড়লে দো‘আ কবুল হয়? সাহাবিরা যে সব হাদীস জানতেন তা তাদের কাছে হাদীস বলে সন্দেহ ছিল নাকি? নাকি তারা এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন? নাকি তাদের কারো জীবনে কোনদিন কোনো বিপদ মুসিবত আসে নি? তারা একটি দিনও একটি হাদীস পড়ে দো‘আ করলেন না তার কারণ কি?

মোটকথা, অভিজ্ঞতার নামে রাসূলের শিক্ষার বাইরে আমাদের কিছু বলার অধিকার নেই।

পাঠক, আশা করি আমরা এই বুখারী খতমের তাৎপর্য বুঝতে পেরেছি। এতো হলো শুধুমাত্র মূল খতমের বিষয়। অর্থাৎ এটি একটি রাসূলের শিক্ষা বিরোধী কর্ম। যার কোনো নজীর বা দৃষ্টান্ত সোনালী যুগে নেই। অপরদিকে খতমে কুরআনের বেলায় তা খেলাফে সুন্নাহ হওয়া ছাড়া আরো যে সমস্ত অতিরিক্ত খারাবী উল্লেখ করা হয়েছিল তার অনেকটা এই খতমে বুখারীতেও রয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তা খতমে কুরআনের তুলনায় অধিক। যেমন:

* কুরআন খতম করা বুখারী খতমের তুলনায় অনেক সহজ। তাই কুরআন সাধারণত খতম তথা পড়ে শেষ করা হয়। খতম না করে মিথ্যা বলার ধোকা কুরআনের বেলায় কম হয়। পক্ষান্তরে বুখারী পুরো পড়া অনেক কঠিন। তাই এখানে খতমের আয়োজকের জিজ্ঞাসার উত্তরে খতম হয়ে গেছে বলে মিথ্যার ধোকা প্রায়ই অপরিহার্য বলে দেখা যায়।

* কুরআন সাধারণত আলেম বলতেই সবাই পড়তে পারে। তাই তাজবীদ, সিফাত, হরক আদায় করে তেলাওয়াত বা অতি দ্রুত তেলাওয়াতের ত্রুটি ছাড়া সাধারণত শব্দ ভুলের ত্রুটি হয় না। পক্ষান্তরে বিজ্ঞ আলেম ছাড়া অনেকেই হাদীস পড়তে পারে না। টাকার স্বার্থে খতমে অংশ নিয়ে সে আল্লাহর রাসূলের বাণীকে তার মনমত ভুল উচ্চারণ করে। এমন ভুলকেও মুহাদ্দিসীনে কেলাম রাসূলের উপর মিথ্যা বলার অপরাধ বলে গণ্য করেছেন।

* ইতোপূর্বে বলেছি যে, বুখারী অধিকাংশ সময়ই খতম হয় না। একজনের অংশ শেষ হলেও আরেকজন তার নির্ধারিত অংশ শেষ করতে পারে না। এক্ষেত্রে মানুষের সাথে মিথ্যা বলা ধোকা দেওয়ার সাথে সাথে দো‘আর সময় আল্লাহর সাথে মিথ্যা বলতে অনেক দিন লক্ষ্য করা গেছে। যেমন. দো‘আয় বলা হয়, “আল্লাহ, এই আমাদের বুখারী খতমকে...” “যে খতম করা হয়েছে...” ইত্যাদি।

* হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পড়া অবস্থায় অনর্থক গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা, ঢং তামাশা থেকে সাধারণত কোনো মজলিসই খালি থাকে না। একমাত্র খতমের আয়োজক সামনে থাকলে তাঁর ভয় বা সম্মানে নিশ্চুপ পড়া হয়। হাদীসের সাথে বেয়াদবী ছাড়া এ সবের নাম কি দেওয়া যায়?

* এই খতমে মাঝে মধ্যে সবচেয়ে বড় আপত্তিকর যে বিষয়টি সংঘটিত হয় তা হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম জপের মাধ্যমে বরকত গ্রহণ যা সম্পূর্ণরূপে শির্ক। কেননা বরকতের জন্য কারো নাম জপ করা তাঁর ইবাদত বা আর্চনার শামিল। বরকতের জন্য একমাত্র আল্লাহর নামই নেওয়া যায়। তাই বরকতের জন্য আল্লাহ ছাড়া কারো নাম এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিলেও শির্কের গোনাহ কাঁধে বহন করতে হবে। কিন্তু অনেক সময় খতমে বুখারীর অনুষ্ঠানের শেষদিকে আসহাবে বদরিয়্যন অর্থাৎ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণ সম্বলিত হাদীসটি সবাইকে শুনিতে পুনরায় পড়া হয়। তাদের নাম নেওয়ার কারণ হিসেবে বরকতের কথা উল্লেখ করা হয় এবং পরবর্তীতে তাদের নামের দোহাই দিয়ে দো‘আ করা হয়। কারো দোহাই দিয়ে দো‘আর ব্যাপারটি খতমে তাসমিয়াতে আমরা আরেকটু বিস্তারিত জানব ইনশাআল্লাহ। এখানে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, বরকতের জন্য আল্লাহ ছাড়া কারো নাম নেওয়া শির্ক।

সত্য সন্ধানী নিঃস্বার্থ ব্যক্তির জন্য এই খতমের তাৎপর্য বুঝতে আর কোনো বেগ পেতে হবে না বলে আশা করি। আল্লাহ সর্বপ্রথম আমাকে অসংখ্য এসব মজলিসে শরীক হওয়ার কারণে যে সব গুনাহ সংঘটিত হয়েছে তা থেকে ক্ষমা করুন এবং আমি সহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। স্বার্থের জন্য দীনকে জলাঞ্জলি দেওয়া থেকে আমাকে এবং সবাইকে বিরত রাখুন। আমীন।

>

ফুটনোট

[1] আবু দাউদ, সুনান, ইলম অধ্যায়, ইলম প্রচারের মর্যাদা পরিচ্ছেদ, নং: ৩৬৬২, তিরমিযী, সুনান, অধ্যায়: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত ইলম, পরিচ্ছেদ: শ্রবণকৃত প্রচারের উৎসাহ, নং: ৩৬৫৬, হাদীস সহীহ।

[2] বিশিষ্ট মুফাসসির তাবিয়ী মুজাহিদ ইবন জাবর আবুল হাজ্জাজ মক্কী, ২১-১০৪ হিজরী। ইবনে আক্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে তাফসীর শিক্ষা লাভ করতেন। (আল-আ‘লাম: ৫/২৭৮)

[3] সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দিমাহ, দুর্বলদের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা নিষেধ অনুচ্ছেদ, ১/১০।

[4] সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত।

- [5] সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দিমাহ, যা কিছু গুনবে তার সব বর্ণনা থেকে নিষেধাজ্ঞা অনুচ্ছেদ, ১/৮।
- [6] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ১০ নং অনুচ্ছেদ জামে' এর হাদীসের সংখ্যা, ১/৪৬৫।
- [7] বিস্তারিত দেখুন, শায়খ আব্দুল্লাহ মুহসিন, আল ইমাম বুখারী ও কিতাবুহ আল-জামি'উস সহীহ।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=11078>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন